বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল-কুরআন: রাসূলুল্লাহর জীবন্ত মু'জিযা

[বাংলা - bengali - البنغالية]

লেখক: আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. মোঃ আবদুল কাদের

2011- 1432

IslamHouse.com

﴿ القرآن: معجزة الرسول الحية ﴾

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: د. محمد عبد القادر

2011- 1432

IslamHouse.com

আল-কুরআন : রাসূলুল্লাহর জীবন্ত মু‘জিযা

আলী হাসান তৈয়ব

আরবী মু‘জিযা শব্দের ইংরেজি অর্থ ‘মিরাকল‘। একে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন : তা এমন একটি কাজ যাকে প্রকৃতির নিয়মে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিংবা তা এমন একটি বিষয় যা মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যের ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ তা এমন একটি ঘটনা যা মানবিক কার্যকারণ ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যাত নয়। সুতরাং মু‘জিযা যেহেতু মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতার আয়ত্বাধীন নয়, তাই তা অবশ্যই সরাসরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার কর্ম বলেই বিবেচ্য।

একটি মু‘জিযা - আল্লাহ তা‘আলার প্রত্যক্ষ কাজ হিসেবে- আল্লাহ তা‘আলার সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রতিফলন ঘটায়। মু‘জিযা মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। এটি প্রমাণিত ও অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ব-জাহানের একমাত্র প্রভু। তাই তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে তাঁরই আনুগত্যের নির্দেশ দেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সাফল্য ও মুক্তির পথ দেখানোর জন্যে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো নবী প্রেরিত হতেন তখন তারা তাঁর কাছে এই দাবি করত, যেন তিনি তাদেরকে মু‘জিযা দেখান। তারা নবী কিংবা রাসূলের আখলাক ও আচরণের প্রতি আগ্রহী ছিল না; সেই বাণীর প্রতিও নয় যা তিনি তাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। বিপরীতে তারা অধিক উদগ্রীব ছিল, যাতে তিনি পারলে তাদেরকে কোনো অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী-রাসূলই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন।

উম্মতের প্রতি সকল নবী-রাসূলের জবাব ছিল একটিই-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨)

‘বল, আমি আমার নিজের কোনো উপকার বা ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।‘[1]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন,

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١)

‘সে বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন।‘[2]

---

1. সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত : ১৮৮।

আরেক স্থানে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

'বল, 'আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।'[3]

যা হোক, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপরিসীম দয়ায় প্রত্যেক নবী-রাসূলকে বহু মু'জিযা দান করেন। এভাবে তিনি সব ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে তাঁর নবী-রাসূলগণের বিশ্বাসযোগ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একদল লোক এসব মু'জিযাকে জাদু ও ভেলকিবাজি বলে একেবারে উড়িয়ে দিত, আরেকদল লোক যারা তাদের বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি ও সাধারণ বোধের যোগ্যতা কাজে লাগাতেন, তারা নবী-রাসূলের এই অতিপ্রাকৃতিক কর্মসমূহকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসেবে গ্রহণ করতেন। তারা অনুসরণ করতেন নিজেদের সম্মানিত নবী-রাসূলের বাণীর।

ইতিহাসও আমাদের এ কথা বলে, প্রত্যেক নবী-রাসূল যে সম্প্রদায় বা যে স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন সে সম্প্রদায় ও স্থানের জন্যে তাদেরকে বহু মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও সত্য। তিনি অগণিত মু'জিযা দেখান, যা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছিল এবং ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে তা যথাযথভাবে লিখিত রয়েছে। তাছাড়া তিনি বহু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যার সবকটিই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন কোনো বিশেষ স্থান ও সময়ের জন্য। আর আল্লাহ তা'আলা এসব নবী-রাসূলকে কিছু বিশেষ মু'জিযা দান করেছিলেন একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্বজাতিকে তা দেখানোর জন্য। এসব মু'জিযা সময় ও স্থানের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। মানব ইতিহাসের অংশ হিসেবে আজ কেবল এসব মু'জিযার গল্প বিদ্যমান। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ রাসূল হিসেবে। পুরো মানব জাতির জন্যে এবং আগত পুরো সময়ের জন্যে। যার দাবি, তাঁর থাকবে এমন একটি সার্বজনীন মু'জিযা যা স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে। মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগের প্রত্যেক ব্যক্তি চাই সে পৃথিবীর যে অংশেই বসবাস করুক না কেন যথার্থই বলতে পারে, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানে আমার নবী হন, তাহলে আমি একথা পছন্দ করি যে, আমার জন্য বর্তমানে একটি মু'জিযা থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সর্বশেষ রাসূল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে তাকে যে সার্বজনীন মু'জিযা দান করেছেন তা-ই আল-কুরআন। পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা আল-কুরআনের বিস্ময়কর প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে অসংখ্য পৃষ্ঠা রচনা করেছেন। বস্তুত বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক প্রজন্মই আল-কুরআনের নতুন নতুন বিস্ময় ও মু'জিযা আবিষ্কার করেছে। এই অশেষ মু'জিযা এ কথার শাশ্বত ও স্থায়ী প্রমাণ যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো মানবজাতির জন্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ।

---

2. সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩০।

3. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৪৯।

আল-কুরআনের বিস্ময়কর প্রকৃতিকে আরও ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে সে স্থান ও কালের দিকে ফিরে দেখতে হবে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫৭১ ঈসায়ী সনে। তৎকালে মানবিক জ্ঞানের স্তর এতই অধপতিত ছিল যে, ঐতিহাসিকরা একে মানবেতিহাসের 'আইয়ামে জাহিলিয়া বা বর্বরতার যুগ ' বলে আখ্যায়িত করেন। সেসময় মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ন্যূনতম জ্ঞানও ছিল না। সাধারণ মানুষ জানত না লেখা-পড়া। না আবিষ্কৃত হয়েছিল মুদ্রণের কলা-কৌশল। ফলে যদি কোনো ব্যক্তি একটি নিশ্চিত মানের জ্ঞান অর্জন করত তবে সে একটি মনোনীত দলের লোক বলে গণ্য হত। সেই জ্ঞান প্রচারের কোনো উপায় বা মাধ্যম ছিল না তৎকালে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মক্কা নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় আরব উপদ্বীপের জীবন ব্যবস্থা ছিল খুব সেকেলে। দেশটি ছিল কান্তার মরু আর অথৈ বালিয়াড়িময়। ছিল না কোনো রাস্তা-ঘাট। না ছিল কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ কিংবা কৃষিব্যবস্থা। আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া এমনকি বর্তমানেও এত উষ্ণ যে, ছায়ার মধ্যেও তাপমাত্রা প্রায়ই ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। এমন রূঢ় আবহাওয়া এবং দারিদ্রের কারণে আরব উপদ্বীপ বিদেশি বণিক কিংবা পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে নি। দেশটি ছিল গোটা বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। ফলে প্রতিবেশি দেশ সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও রোমে যে সামান্য জ্ঞানের চর্চা ছিল তাও আরব উপদ্বীপ অবধি পৌঁছাতে পারে নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাতে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, লোকেরা সেখানে যাযাবরের মত বসবাস করত। তারা তাদের গবাদিপশু ও পরিবারের জন্য বৃষ্টি ও চারণভূমির তালাশে নিয়মিত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হত। সেখানে ছিল না কোনো সরকার কাঠামো। না ছিল কোনো নাগরিক সুবিধা। কোনো সুসংহত নগর-আইনও ছিল না। লোকেরা গোত্রে গোত্রে বসবাস করত। গোত্রের শক্তি ও প্রতিপত্তিই একজন ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার হিসেবে বিবেচিত হত। 'জোর যার মুল্লুক তার ' কেবল এ নীতিই সে ভূখণ্ডে কার্যকর ছিল। অপেক্ষাকৃত শক্তিধর গোত্রগুলি দুর্বল গোত্রদের ওপর প্রায় লুটতরাজ ও লুণ্ঠন চালাত। এটিই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। পরন্তু গোত্রের শক্তি-সামর্থ্য নির্ভর করত পুরুষদের সংখ্যার ওপর। আপদ ও বোঝা জ্ঞান করা হত নারীদের। প্রায় অভিভাবই চাইত না এ বোঝা বহন করতে। সেহেতু তারা আত্মজ কন্যাকে হত্যা করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকালীন পরিবেশ-প্রতিবেশ ও তৎকালীন অবস্থার উল্লেখ করার পর তাঁর শৈশবকালীন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করা সমীচীন ভাবছি। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান। মাকেও হারান ছয় বছর বয়সে। তারপর তাঁর দেখাশুনার ভার নেন দাদা। কিন্তু তিনিও পরপারে পাড়ি জমান যখন তাঁর বয়স আট হয়। তিনি তখন আপন চাচার ঘরে স্থানান্তরিত হন। এই চাচা কেবল তাঁকে আশ্রয় দান করেছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য কিংবা জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণে সক্ষম ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাই গবাদি পশু চরিয়ে চাচাকে সহযোগিতা করতেন। যে কেউ দেখতে পাবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাল্য-জীবন আর দশ জনের মতো ছিল না। পিতা, মাতা কিংবা পিতৃব্যের ভালোবাসা ও আদর-যত্ন বলতে যা বুঝায়, তিনি তা পান নি। ছিল না তাঁর কোনো স্থায়ী কোনো নিবাস। এক অভিভাবক থেকে আরেক অভিভাবকের কাছে হাত বদল হন। এই বিরূপ

ও রূঢ় পরিস্থিতির কারণে ন্যূনতম জ্ঞান কিংবা শিক্ষা যা তখন মক্কায় প্রচলিত ছিল- তাও অর্জন করার সুযোগ তাঁর ছিল না।

ঐতিহাসিকরা লিখেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না লিখতে জানতেন, না পড়তে। এমন কি তিনি নিজের নামটি পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে জানতেন না। পরন্তু তাঁর জীবনের এমনতরো রূঢ় ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁকে সেসব হাতে গোনা গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকদের সাহচর্যে বসারও সুযোগ দেয় নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে মাত্র দু'বার দীর্ঘ সফর করেছেন। প্রথম সফর ছিল তাঁর আট বছর বয়সে। দ্বিতীয়বার সফর করেন যখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। উভয়টি ছিল সিরিয়ায় এবং খুব সংক্ষিপ্ত। তাও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। কখনো কোনো ঐতিহাসিক একথা লিখেন নি যে, এই সফরগুলি তাঁকে এমন কিছু জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছিল যা তিনি পরবর্তীতে আল-কুরআনে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি একজন সাধারণ আরব বেদুঈনের মত খুব সহজ সরল ও সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। একজন জনসমাবেশের বক্তা হিসেবে তিনি না পরিচিত ছিলেন, না একজন কাব্য রচয়িতা হিসেবে। আর না অন্য এমন কোনো কাজ করেছিলেন যা তাঁর প্রতি অন্যান্যদের দৃষ্টি কাড়ে।

তিনি কোনো ধরনের বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ কিংবা যুদ্ধে জড়াতেন না। বলাবাহুল্য, মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা করত এবং যখন তারা কা'বায় প্রবেশ করত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বস্ত্র ত্যাগ করত। এ ছিল তাদের প্রার্থনা-রীতির অংশ। এ রকম পরিস্থিতিতে তিনি বেড়ে উঠেন। একটি মাত্র বিষয় যা ঐতিহাসিকরা তার বাল্য জীবন সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল, তিনি তাঁর সততা এবং সদাচারের জন্য সুপরিচিত এবং সবার শ্রদ্ধা-ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। এ জন্যই মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী এবং 'আস-সাদিক' বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন, আল্লাহ তাঁকে পুরো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তখন সহসাই পাল্টে যায়। অচিরেই তাঁকে দেখা যায় নানা সফল ভূমিকায়। ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রনায়ক, বক্তা, সৈনিক, সেনানায়ক, নেতা, আইন প্রণেতা, বিচারক, চুক্তিসম্পাদনকারী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্বামী, পিতা- হেন কোনো ভূমিকা নেই যাতে তিনি ব্যর্থ। সফলতার এমন বহুমুখিতা দেখেই একজন ইয়াহূদী ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট তার বিখ্যাত 'দি হান্ড্রেড' নামক মানবজাতির একশ মহান ব্যক্তিত্বের জীবনীতে তাঁকে সবার শীর্ষে উল্লেখ করেন।

এই আল-কুরআনই মানবতার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মানব জাতির ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই। অন্যান্য নবী-রাসূলের মু'জিযা তাদের জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কুরআন মাজিদ কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত মু'জিযা হিসেবে অক্ষত থাকবে। আল-কুরআন এমন অসংখ্য তথ্যধারণ করে যা তা অবতীর্ণ হওয়ার সময় মানুষের জানা ছিল না। এসব তথ্যসূত্রের অনেকগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে নিশ্চিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত প্রত্যেক যুগে মানুষ আল-কুরআনে নতুন নতুন 'মিরাকল 'বা মু'জিযা আবিষ্কার করেছে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে, ততই তা আল-কুরআনের মু'জিযার তালিকাকে দীর্ঘ করছে।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨)

'আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং তোমার নিজের হাতে তা লিখনি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে।'[4]

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٨)

'এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে। নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[5]

---

[4]. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত : ৮৮।

[5]. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩৭-৩৮।